ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 24- 29
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.175

বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ

ড. বিকাশ নার্জিনারী, *স্বাধীন গবেষক, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In his novel 'Nun Cha Chaier Deshre Nunkatha', Bimal Lama has given literary form to the life and folk culture of the Nepali-speaking people of the Darjeeling hills of North Bengal. In this novel, along with the description of rivers, villages, mountains and nature, the folk beliefs, folk weapons, folk customs, folk musical instruments, folk deities, folk addictions, etc. of the Nepali community are clearly reflected. Here, the use of flour gutli, vermilion, lamps, five grains, etc. on banana leaves to drive away evil spirits; the custom of blowing jhankari; considering khukuri as a weapon of heroes; the cremation of Tamangs and the burial of Rais in the event of death—all are signs of regional beliefs. Folk musical instruments such as dhangro, jhamta, kangling, etc. are used in spiritual and tantric rituals. Bamboo utensils such as flower vases reflect the multifaceted role of bamboo in rural life. The formless form of folk deities, such as the goddess's position at the root of a rubber tree, is a sign of worship of local nature. In addition, festivals and folk customs such as 'Chulai', Gai Tyuhar, Vaitika, etc. reveal the socio-cultural life of the Nepali community. The mixture of Hinduism and Buddhism is also evident in the novel—such as the presence of the practice of animal sacrifice among Buddhists.

Keywords: Nuun Cha, Bimal Lama, Folk Elements, Nepali Community, Folk Beliefs, Jhankari, Folk Weapons, Tamang and Rai Janajati, Folk Musical Instruments, Bamboo and Folk Crafts, Gai Tyuhar, Vaitika

সাম্প্রতিককালের একজন ঔপন্যাসিক হল বিমল লামা। দার্জিলিং-এর চা-বাগান নিয়ে তার লেখা অন্যতম উপন্যাস হল 'নুন চা চায়ের দেশের নুনকথা' (২০১২)। এই উপন্যাস নেপালি ভাষায় 'নুনকো চিয়া' নামে অনুবাদ হয়। তার জন্ম ১৯৬৮ সালের ৪ঠা জুলাই, দার্জিলিং পাহাড়ের চা-বাগান ঘেরা একটি গ্রামে। তার লেখা 'লোচন দাস শব্দকর' উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়ে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তার অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল 'রুশিকা' (২০১৬), 'হুদুর দুর্গা', 'ব্রজযোগিনী' (১৪২৯), 'ডুংরির পলাশ বনে' (২০২৫) প্রভৃতি। আবার সাম্প্রতিককালে প্রকাশ পেয়েছে 'সালোকসংশ্লেষ' নামে একটি উপন্যাস শারদীয় ১৪৩২ বর্তমান পত্রিকায়।

বিমল লামার উপন্যাসে লোকজ উপাদান কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনায় প্রবেশ করার আগে লোকজ উপাদান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ইংরেজি 'Folklore' -এর সর্বজন গ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ ধরা হয় 'লোকসংস্কৃতি'। তবে 'Folk' এর প্রতিশব্দ 'লোক' শব্দটি গৃহীত হলেও 'lore' এর প্রতিশব্দ রূপে দেখা দিয়েছে— কলা, কৃষ্টি, যান, চর্যা, বার্তা, ঐতিহ্য প্রভৃতি। আর লোকজ উপাদান বলতে আমরা এই লোকসংস্কৃতিকেই বুঝব।

অর্থাৎ লোকজ উপাদান হল লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই লোকজ উপাদানকে বুঝতে লোকসংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা— ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি এবং খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি।

ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Material Folklore): লোকজ জীবনে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত বস্তুসমূহকেই এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে যে বিষয় বিরাজমান তা হল— লোকযান, লোকঅস্ত্র, লোকযন্ত্র, লোকশিল্প, লোকপরিচ্ছদ, লোকপ্রযুক্তি, লোকখাদ্য, লোকঔষুধ, লোকাভরণ, লোকপানীয়, লোকতৈজস ইত্যাদি।

খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Formalised Folklore): এই লোকজ উপাদানটি মূলত লোকায়ত সমাজজীবনে মনের ভাব বিনিময়, আনন্দ বেদনা, বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আদিযুগ থেকে আজ সভ্যতার উষালগ্ন পর্যন্ত মানুষ মনের মধ্যে নানান বিশ্বাস সংস্কার সত্য মিথার বেড়াজালে বন্দি। যেমন— আমরা সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকি। লোকসংস্কৃতির এই লোকজ উপাদানটি টোটেম ট্যাবু নামে পরিচিত। এই পর্যায়ের উপাদানগুলি হল— লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকগালিগালাজ ইত্যাদি।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নেপালি ভাষী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিস্তা, ছোটা রঙ্গিত, বালাবাস প্রভৃতি নদীর প্রসঙ্গ রয়েছে। বিজন বাড়ি এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা মেলে এই উপন্যাসে। এইসকল স্থানের নেপালি সম্প্রদায়ের ভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকনেশা, লোকঅস্ত্র, লোকপ্রথা, তামাং ও রাই সম্প্রদায়ের নিজস্ব রীতি-পদ্ধতি, লোকবাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি লক্ষ করা যায় এবং তার সঙ্গে পাহাড়ের সেইসকল স্থানের প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যেরও দেখা মেলে।

এই উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে। উপন্যাসে রয়েছে—

> "উরগেন দেখল, কলাপাতার ওপর আটার তৈরি কয়েকটা গুটলি পুতুল। মানুষ আর জন্তুর আদলে তৈরি। কয়েকটা মন্দির চূড়ার মত। তাতে সাদা সাদা কি লেগে আছে। লাল সিঁদুরও মাখানো আছে কয়েকটাতে। পোড়া ধূপকাঠি কয়েকটা। আছে মাটির নিভে যাওয়া প্রদীপ, পোড়া সলতে, কলাপাতার ওপর শুকনো রক্তের দাগ। একমুঠো পঞ্চ শস্য। তেমাথা মোড়ে রাতে কেউ রেখে গেছে। যে রেখেছে, তার ইচ্ছে, কেউ ডিঙোক। তাহলে তার বালাই ঘাড় বদলায়। ঝাঁকরিকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়ে দুষ্ট আত্মা তাড়ানোর আয়োজন। কিন্তু জেনে শুনে কেউ কখনও ডিঙোবে না এ জিনিস। পাহাড় জঙ্গলে একে অছেদ্দা করার সাহস কারও নেই। একবার ডিঙোলে তেরাত্তির পেরোবে না, তখন যত বড়োই ঝাঁকরি ডাকো সে বালাইয়ের হাত থেকে মুক্তি নেই। আর এ কোনও হাওয়ামুখী গল্প নয়। ধনবানধুরায় অনেক আছে এর ভুক্তভোগী। বুদ্ধিরাম সেই কোন ছোটোবেলায় একবার লাথি মেরেছিল ওই আটার পুতুলে। তার সেই পা এখন পঙ্গু। লাঠি নিয়ে ঘষটে চলতে হয়। কত ঝাঁকরিই তো দেখাল ওর মা। এমনকি ভাদুরে পূর্ণিমায় মাকালবাবার থানে পর্যন্ত নিয়ে গেছিল তিনবার। সেখানে পাহাড় দেশের বড়ো বড়ো ঝাঁকরিরা পর্যন্ত ওর ঝাড়ফুঁক করেছে। কোনও লাভ হয়নি। আর এইসব ঝাঁকরিরা সোজা লোক না। তাদের এক পা ভূতের ঘরে তো এক পা মানুষের ঘরে। মাঝে দাঁড়িয়ে সব সামলায়। বলা যায় ভূতের দালাল।"[১]

এই লোকবিশ্বাসের অনুরূপ ঔপন্যাসিক তিলোত্তমা মজুমদারের 'মানুষশাবকের কথা' উপন্যাসে দেখা যায়। তার উপন্যাসে বিহারি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস কারো গৃহে অসুখ হলে পুরানো কুলো, ঝাঁটা, জবাফুল, সিঁদুর প্রভৃতি রাস্তার চৌমাথায় রাত্রিবেলা চুপি চুপি ফেলে দেওয়া হত। যে এসব উপকরণগুলি মাড়িয়ে যাবে তার বাড়িতে অসুখ চলে যাবে। তবে তার আগে বাচ্চারা সেইসব উপকরণের মধ্যে পেচ্ছাপ করে দিলে কারও কিছু হবে না। তবে বিমল লামা 'নুন চা' উপন্যাসে নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিয়েছেন গৃহের মধ্যে দুষ্ট আত্মা থাকলে তাকে তাড়ানোর জন্য নানা ধরনের উপকরণ দিয়ে পূজা করে রাস্তার তেমাথায় ফেলে দেওয়া হত। তবে এই নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপকরণগুলি ভিন্ন। ঔপন্যাসিক বিমল লামার উপন্যাসে রয়েছে সেই উপকরণগুলি। উপকরণগুলি

হল কলাপাতা, আটার তৈরি ছোটো ছোটো গুটলি, যা মানুষ ও জন্তুর আদলে তৈরি করা হয়, সিঁদুর, পোড়া ধূপকাঠি, মাটির নিভে যাওয়া প্রদীপ, পোড়া সলতে, পঞ্চশস্য প্রভৃতি।

বিমল লামার এই উপন্যাসে নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেকটি লোকপ্রথা বা লোকবিশ্বাস দেখা যায়। উপন্যাসে রয়েছে—

> “এই অঞ্চলে লোকে তীর-ধনুক পর্যন্ত ব্যবহার করে না। ওটাকে অশুভ অস্ত্র মনে করে। অপদেবতাদের ব্যবহারের জন্য। হয়তো সেগুলো ব্যবহার করলে অপদেবতার কোপে পড়ার ভয় আছে। আবার তীরধনুকের ব্যবহারে এক ধরনের কাপুরুষতাও দেখে থাকতে পারে এদের পূর্বপুরুষ। তাই বীরের অস্ত্র খুকুরির ওপরই ভরসা রেখেছে আজীবন।”[২]

উপন্যাসের মধ্যে নেপালিদের আরেকটি লোকপ্রথা দেখা যায়। উপন্যাসে দেখা যায় ভাল্লুকের আক্রমণে চ্যাংবা তামাং এবং রাজেশ রাই এর মৃত্যু হয়েছিল। নেপালিদের মধ্যে চ্যাংবা তামাং ছিল তামাং সম্প্রদায়ের লোক এবং রাজেশ রাই ছিল রাই সম্প্রদায়ের লোক। তাদের নিজ নিজ লোকপ্রথা রয়েছে। কোনো সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ মারা যাওয়ার পর কবর দিয়ে থাকে আবার কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ মারা গেলে দাহ করে থাকে। উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় তামাং জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে এবং রাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়—

> “চ্যাংবাকে দাহ করা হবে কারণ সে তামাং। কিন্তু রাজেশ রাই, তাকে কবরস্থ করা হবে।”[৩]

উপন্যাসে নেপালি সম্প্রদায়ের লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে রয়েছে—

> “লাভা, ঝ্যামটা, চ্যাংরো, কাংলিং, ঘ্যারলি এইসব বাদ্যযন্ত্র দিনভর বাজতে থাকবে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে।”[৪]

তামাং জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুর পর থেকে শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত শ্রাদ্ধ বাড়িতে তেরোদিন ধরে আত্মার শান্তি কামনার জন্য বাজানো হয়ে থাকে লামাদের দ্বারা এই বাদ্যযন্ত্রগুলি। তবে রাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়নি উপন্যাসে। উপন্যাসে রাজেশ রাই এর শ্রাদ্ধের সময়কার বর্ণনা রয়েছে এইভাবে—

> “রাইদের শ্রাদ্ধে অত জটিলতা নেই। রাজেশের শ্রাদ্ধ ওর বাড়ির লোক তিন দিনের মাথায় সেরে ফেলেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা সমবেত হয়েছে মৃত আত্মার স্মরণে আয়োজিত ভোজে অংশ নিয়েছি। সন্ধ্যায় বিজুয়া পুরোহিত ডেকে বিশেষ শুদ্ধিকরণ পূজা সম্পন্ন করেছে।”[৫]

তামাং সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো তারা বিভিন্ন পূজাপার্বণে ব্যবহার করে থাকেন। উপন্যাসে এই বাদ্যযন্ত্রগুলো আত্মার শান্তি বা আত্মা তাড়ানোর জন্য তান্ত্রিকদের দ্বারা এই বাদ্যযন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়—

> “দেওইয়ালের এক কোণে নানা বাদ্যযন্ত্র। একটা কালো কাঠের তৈরি ঢ্যাংরো। তার দু’পিঠের চক্চকে চামড়া দেখেই বোঝা যায়। এটা নিয়মিত বাজানো হয়। একটা দণ্ডের ওপর সেটা আটকানো। বাজানোর জন্য ছোট্ট একটা বাঁকা কাঠের গজা। ঢ্যাংরোর দণ্ডে লাল নীল সবুজ, তিন রঙের একগুচ্ছ সরু ফিতে বাঁধা। মোষের শিং দিয়ে তৈরি একজোড়া শিঙা এক পাশে। মানুষের নলির হাড় দিয়ে তৈরি কাংলিং। পেতলের ঝ্যামটা। ডিমের মাপের এককেটা ঘুঙুর দিয়ে তৈরি লম্বা একটা মালা। ছোটো নূপুর জড়ানো একজোড়া পায় বাঁধার পাটি।”[৬]

লোকজ বাদ্যযন্ত্র একটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবনযাপন ও বিশ্বাসের প্রতীক। এগুলি কেবলমাত্র বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, সামাজিক সমাবেশ ও লোকনাট্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে রয়েছে। এই উপন্যাসে বর্ণিত নেপালিদের বাদ্যযন্ত্র ‘ঢ্যাংরো’ হল কালো কাঠের তৈরি ও দুই পিঠে চামড়া টানানো ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এর সঙ্গে বাঁকা কাঠের ‘গজা’ ব্যবহার হয়, যা তাল দেওয়ার জন্য শক্ত ও গভীর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। দণ্ডে বাঁধা লাল-নীল-সবুজ ফিতে প্রতীকি রঙের এই বহুমাত্রিকতা উৎসব, আচার বা দেবতার পূজায় শুভতার পরিচায়ক। আবার ‘শিঙা’ হল মোষের শিং থেকে তৈরি এই বায়ুবাদ্য প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ জীবনে সংবাদ প্রচার, মিছিল, পূজা, শিকার কিংবা সামাজিক সমাবেশে ডাক দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে

এসেছে। এর ধ্বনি শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক। তারপর 'কাংলিং' মানুষের উরুর হাড় দিয়ে তৈরি এক ধরনের তিব্বতি-ভুটানি বায়ুবাদ্য, যা মূলত বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর উপস্থিতি নির্দেশ করে সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মিলন ও সংস্কৃতির সমন্বয়। আবার 'ঝ্যামটা' (পেতলের) ঝনঝন ধ্বনি উৎপন্ন করা এই ঝংকারবাদ্য মন্ত্রপাঠ, নৃত্য বা যাত্রায় ছন্দতাল বজায় রাখতে দেখা যায়। এটি সমবেত বাদ্যযন্ত্রের অংশ হিসেবে সম্মিলিত একাত্মতা প্রকাশ করে। তারপর 'ঘুঙুরমালা' ডিমের মতো ছোটো ঘুঙুর দিয়ে তৈরি মালা মূলত নৃত্যের সময় বিশেষ শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেহের নড়াচড়ার সঙ্গে সুরেলা ঝংকার সৃষ্টি করে, যা লোকনৃত্যে ভঙ্গিমাকে ছন্দময় করে তোলে। আবার 'নূপুর ও পাটি' ছোটো নূপুর বাঁধা পাটি পায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তালের অনুষঙ্গ হয়। এগুলি নৃত্যের ছন্দকে শরীরবদ্ধ রূপ দেয় এবং আধ্যাত্মিক-ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্যকে সংযুক্ত করে রাখে। এই বাদ্যযন্ত্রসমূহ শুধু শব্দসৃষ্টি করে না, বরং একটি লোকসমাজের ধর্মীয়-সামাজিক পরিচয়, সাংস্কৃতিক আচার, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও সামষ্টিক আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। কাঠ, চামড়া, শিং, হাড়, ধাতু—এমন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হওয়া এই বাদ্যযন্ত্রগুলো লোকজ জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। সুতরাং এরা একাধারে লোকজ শিল্প, ধর্মীয় উপকরণ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

লোকজ উপাদান বাঁশ নানান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'লোকজ শিল্প' গ্রন্থে মঞ্জরী চৌধুরী তাঁর 'ত্রিপুরার লোকশিল্পে বাঁশ' প্রবন্ধে লোকজীবনের বাঁশের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> "অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানবসমাজে বাঁশ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য বস্তু হিসাবে জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বাঁশ ব্যবহার করেই বাসযোগ্য উন্নতমানের গৃহনির্মাণ এখন সম্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে খুঁটি, পাইর, তির, বেড়া, চালের কাঠামো, ছাউনি, বাঁধবার বেত এই সবই বাঁশ দিয়ে তৈরি। বাঁশকে লম্বালম্বি ছেঁচার পর চিরে দা দিয়ে খুঁটে করা হয় তরজা। এই তরজা দিয়ে ঘরের বেড়া ও ছাউনির কাজ হয়। তরজার বেড়ার মধ্যেও নিজের শিল্পীসত্তার ছাপ রেখে দেন কোনো কোনো কারিগর। নিপুণ বাঁশশিল্পীর হাতে তৈরি তরজার বেড়া পাটির মতো মুড়ে নেওয়া যায়।"[৭]

এছাড়াও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালি সরঞ্জাম রয়েছে যা দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে লোকজীবনে, যেমন— মাছ ধরার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র, ঘরে ব্যবহৃত চালুনি, টুকরি, ঝুড়ি, ডালা, ফুলদানী, মাচা, বেড়া, সাঁকো প্রভৃতি। এই উপন্যাসের মধ্যে বাঁশের তৈরি ফুলদানি প্রসঙ্গ রয়েছে—

> "খুকুরিটা হাতে নিয়ে পড়ে থাকা বাঁশটার দিকে এগিয়ে গেল উরগেন। তার থেকে একগাঁট বাঁশ কেটে নিল। একদিকের গাঁট কেটে ফেলতেই একমুখ খোলা চোং হল একটা। চোংটা হাতে নিয়ে উরগেন ফিরে এল জুনির কাছে। তারপর খুব মন দিয়ে চেঁচে পরিষ্কার করতে লাগল বাঁশের চোংটা। কিছুক্ষণের পরিশ্রমের পর একটা মসৃণ বাঁশের ফুলদানি তৈরি হল। সেটা জুনির হাতে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে রাখবে ফুলগুলো'। জুনি ফুলদানিটা নিয়ে ওরাসগুলো একটা একটা করে সাজাতে লাগল তার মধ্যে। উজ্জ্বল লাল গুরাসের একটা ঝলমলে তোড়া তৈরি হল সবুজ ফুলদানির ওপর। জুনি দু'হাতে ফুলদানিটা তুলে ধরে বলল, 'কী সুন্দর লাগছে, না?'[৮]

বাঁশ দিয়ে তৈরি লোকজ উপাদানের ব্যবহার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের রাভা জনজাতির নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোতে রয়েছে।

গ্রামীন লোকজীবনে লোকদেবতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সব লোকদেবতা বেশিরভাগ নিরাকার দেখা যায়। যার কোনো আকার নেই, আবার আদ্য আকার হয়ে থাকে। যেমন বড়ো পাথর বা গাছ। প্রকৃতির উপাসকদের মধ্যে এই লোকদেবতা অধিক পরিমানে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের নানা জনজাতির মধ্যে এইসব লোকদেবতার দেখা মেলে। এইসব লোকদেবতাদের নিয়ে নানা লোককথা প্রচলিত হয়েছে। বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাসে তেমনি নেপালিদের মধ্যে লোকদেবতার বর্ণনা দেখা যায়। উপন্যাসে রয়েছে—

> "আজ দেবী পুজো, ধনমানধুরার সবচেয়ে জাগ্রত দেবী। কিন্তু এই দেবীর মুখ কেউ দেখেনি, কারণ এর কোনও মূর্তি নেই। আবার পুরোপুরি নিরাকারও নন ইনি। মাঝামাঝি সমাধানের মতো

একটা শিলাখণ্ডের চেহারা নিয়ে অধিষ্ঠান করছেন। এঁর কোনও মন্দিরও নেই। ওই প্রাচীন রবার গাছের মূলেই এঁর পবিত্র স্থান।"[৯]

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসগুলোতে এই ধরণের লোকদেবতার উল্লেখ করেছেন। এমন অনেক লোকদেবতা দেখা যায় যেখানে হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মের মধ্যে পালন করা হয়। তেমনি অনেক প্রকৃত উপাসক জনজাতির মধ্যে খৃস্টান, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম গ্রহন করলেও হিন্দু রীতি বা প্রকৃতির উপাসনা করতে দেখা যায়। বিমল লামা তার 'নুন চা' উপন্যাসে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণ দেখিয়েছেন। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে পশুবলি দেওয়ার প্রথা না থাকলেও উপন্যাসে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তামাং জনজাতিরা লোকদেবতার জন্য পশু বলি দিচ্ছে। উপন্যাসে রয়েছে তার চিত্র—

> "কী কারণে যেন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটাই দেবী পুজোর দিন। ছোটোবড়ো পশুপাখি বলি দেওয়ার সময় কারও খেয়াল থাকে না, আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। যদিও গ্রামের অর্ধেকের বেশি লোক নিজেদের বৌদ্ধই মনে করে। নিয়মিত গুফায় যায়। বৌদ্ধমতে বিয়ে শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু ওই দিন ধনমানধুরার শিশুরা জানে আজ দেবীপুজো।"[১০]

লোকনেশা 'চুলাই' এর প্রসঙ্গ রয়েছে উপন্যাসে। উত্তরবঙ্গের নানা জনগোষ্ঠী এই চুলাই তৈরি করে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যা বিভিন্ন নামে পরিচিতি। যেমন— নেপালিরা বলে থাকে রকশি, বোড়ো-মেচরা জৌউ, রাভারা বলে থাকে চকত, আদিবাসীরা দারু প্রভৃতি। অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে এই দেশী মদের ব্যবহারে প্রসঙ্গ এনেছেন। নুন-চা উপন্যাসে নেপালি জনগোষ্ঠীর চোলাই বানানোর পদ্ধতি দেখা যায়—

> "ততক্ষণে ওদিকে চোলাই করার টিনের ওপর রাখা হাঁড়ির জল গরম হয়ে পড়েছে। এই জল ওপর থেকে বদলে দেওয়া দরকার। না হলে হাঁড়ির তলায় বাষ্প জমবে না, মানে ঠিকমতো চোলাই হবে না। এই জলধারা থেকে প্রতিমাকেই টেনে আনতে হয়। শুধু গরম করো আর ফেল, অবশ্য এই গরম জলে হাত-মুখ ধুতে বা চান করতে বেশ আরাম।"[১১]

এই উপন্যাসে নেপালিদের গাই তিউহার, ভাইটিকা দেওয়ার প্রথা দেখা যায়। গাই তিউহার দেওয়ার লোকপ্রথা অনুসারে গাইয়ের কপালে টিকা ও গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া। এই লোকপ্রথা রাজবংশী, বোড়ো-মেচ, আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত উত্তরবঙ্গের নানান গ্রামে। দেবেশ রায় 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই লোকপ্রথার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। বিমল লামা তার 'নুন চা' উপন্যাসে নেপালিদের মধ্যে এই লোকপ্রথা দেখিয়েছেন—

> "দিন গুনে গুনে অবশেষে পৌঁছে গেল অউসি, ঘোর অমাবস্যা— গাই তিউহার। সকাল সকাল গাইয়ের কপালে টিকা দিয়ে গো-মাতাকে প্রণাম। তারপর চারদিকে গাঁদার মালা-দরজা-জানলা-খাম্বা রেলিং, পারলে চালের কিনারা পর্যন্ত। রান্না-খাওয়া-হইহল্লা, হাহা-হিহি-শুভেচ্ছা। তারপর দিন ফুরিয়ে অউসিতে আকাশ ঢেকে গেলে পাহাড় জুড়ে লক্ষ লক্ষ মাটির প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোয় পথ চিনে চিনে মেয়ে দলের গ্রাম পরিক্রমা। ঘরে ঘরে গিয়ে মিহি কণ্ঠে গেয়ে ওঠে
> 'সুশীলা-সরু-শিলা-মুনা-সূর্যজ্যোতি,
> ভৈলেনি আয়ো আঙ্গন মা/বড়ালি
> কুড়ালি রাঅ ন/অউসি কো দিন, গাই তিউহার
> হো, ভৈলো!'
> গাই তিউহারের পরদিন গোরুর কপালে টিকা দেওয়ার দিন। তারপর ভাইটিকা। সেদিন পাহাড়ের সব ভাই বোনের কাছে ছুটে আসবে টিকা নিতে। সে যতই কাজ থাক।"[১২]

'নুন চা' উপন্যাস কেবল দার্জিলিংয়ের নেপালি সম্প্রদায়ের জীবনের কাহিনি নয়, বরং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জনপদের লোকজ সংস্কৃতির একটি জীবন্ত দলিল। এখানে লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা, লোকঅস্ত্র, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকদেবতা, লোকনেশা, বাঁশের ব্যবহার, উৎসব প্রভৃতি মিলিয়ে পাহাড়ি জনজাতির লোকজীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছে। ঔপন্যাসিক বিমল লামা এই উপন্যাসে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে নেপালি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক

জীবনচিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলত, এই উপন্যাস একদিকে নৃতাত্ত্বিক নথি, অন্যদিকে লোকজ উপাদান নির্ভর আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. লামা, বিমল। নুন চা চায়ের দেশের নুনকথা। সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ সংস্করণ- আগস্ট ২০২০, কলকাতা-০৯, পৃ. ৯।

২. তদেব, পৃ. ৩৮।

৩. তদেব, পৃ. ৪৩।

৪. তদেব, পৃ. ৪৮।

৫. তদেব, পৃ. ৪৮।

৬. তদেব, পৃ. ৫১।

৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার সম্পাদনা। লোকজ শিল্প। পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ২০১১, কলকাতা-১১, পৃ. ১৪৫।

৮. তদেব, পৃ. ৯১।

৯. তদেব, পৃ. ৯৩।

১০. তদেব, পৃ. ৯৪।

১১. তদেব, পৃ. ২৪২।

১২. তদেব, পৃ. ৪৬৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধান। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, কলকাতা-৭৩।

২. বন্দ্যোপাধায়, সুভাষচন্দ্র। বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৭, প্রথম সংস্করণ (করুণা) জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-০৪।

৩. পাল, স্বপ্না। বাংলা উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (বঙ্কিম থেকে কল্লোলযুগ)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উপস্থাপিত ২০০২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. ইসলাম, শেখ মকবুল। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১১, কলকাতা ০৯।

৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সম্পাদিত। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, কলকাতা ৭৩।

৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭, কলকাতা ০৯।